OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 41*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 374 - 382*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 374 - 382*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848*

# গণনাট্য থেকে নবনাট্যে উত্তরণ : শম্ভু মিত্রের নাট্যদর্শনের রূপান্তর

ড. অচিন্তকুমার ব্যানার্জী
সহযোগী অধ্যাপক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মকদমপুর, মালদা
ও
শিউলি দাস
গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মকদমপুর, মালদা
Email ID: mamondas187@gmail.com

***Received Date*** *15. 06. 2026*
***Selection Date*** *15. 07. 2026*

***Keyword***
*Shambhu Mitra, IPTA (Indian People's Theatre Association), New Theatre Movement (Nabanatya), Bahurupi, Theatre Philosophy, Theatrical Transformation, Chand Banik, Group Theatre, Bengali Theatre.*

***Abstract***
*Shambhu Mitra's transition from the IPTA (Indian People's Theatre Association) movement to the New Theatre (Nabanatya) movement marks a significant cultural and aesthetic phase in the history of Bengali theatre. This paper examines the evolution of Mitra's theatrical philosophy, tracing its transformation from the collective, politically oriented ideology of IPTA to the autonomous, humanistic, and individual-centered vision of theatre that he developed through Bahurupi. The study argues that this transition reflects not only a change in organizational affiliation but also a fundamental shift in his artistic outlook. Shambhu Mitra was not only an eminent actor and theatre director but also an original playwright and essayist. His Chand Baniker Pala is regarded as a landmark contribution to Bengali dramatic literature. Although the play was never fully staged during his lifetime, Mitra presented public readings of it on several occasions, and recordings of these performances have been preserved. His other notable plays include Ulukhagra, Bibhab, Ghurani, and Kanchanranga. He also wrote several influential essays on theatre, among which Kake Bole Natyakala (What is Theatre Art?) and Prasanga: Natya (On Theatre) are particularly significant. The paper further analyses the evolution of Mitra's theatrical vision through his early dramatic works and major productions, including Ulukhagra, Jabanbandi, Nabanna, Pathik, Chera Tar, Bibhab, Char Adhyay, Dashachakra, Raktakarabi, Putul Khela, Raja, Bisarjan, and Raja Oedipaus. It argues that Mitra conceived theatre not merely as an instrument of political propaganda but as an autonomous artistic medium for exploring the complex relationship between the individual, society, and truth. Through the establishment of Bahurupi, he laid the foundations of a distinct aesthetic and humanistic tradition within the Bengali New Theatre movement. Thus, his*

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 41*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 374 - 382*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

*transition from IPTA to Nabanatya represents not merely an institutional shift but a fundamental transformation in Bengali theatrical thought, one that has had a lasting impact on the development of modern Bengali theatre.*

## Discussion

বাংলা নাট্যজগতে শম্ভু মিত্র এক অনন্য সাধারণ নাট্যব্যক্তিত্ব। তাঁর নাট্যদর্শন কোন আকস্মিক ঘটনার ফল নয়, তা মূলত তাঁর দীর্ঘ অধ্যাবসায়, আত্মানুসন্ধানী মন, সামাজিক সচেতনতা, এবং ধারাবাহিক নাট্যরীতির বিরুদ্ধে অবিরত প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিল। নাট্যকারের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবন – এই দুইক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, আপসহীন এবং যুক্তিনিষ্ঠপরায়ণ ব্যক্তিত্ব। নিজস্ব বিশ্বাসের প্রশ্নে তিনি কখনো জনমতের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। বরং বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতেও নিজের পথেই অটল থেকেছেন। আর এই দৃঢ় অবস্থান তাঁর জীবনকে যেমন স্বতন্ত্র পরিচয় এনে দিয়েছে, তেমনি তাঁকে এক দীর্ঘ নিঃসঙ্গ সংগ্রামের মধ্য দিয়েও অগ্রসর হতে হয়েছে। প্রবল সমালোচনা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর শিল্পচিন্তা, নাট্যদর্শন ও নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি।

শম্ভু মিত্র কলকাতার ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২২শে অগাস্ট ১৯১৫ সালে। তাঁর পিতার নাম শরৎকুমার ও মাতার নাম শতদলবাসিনী দেবী। হুগলি জেলার অন্তর্গত কলাছাড়া গ্রামে তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল। তিনি ১৯৩১ সালে বালিগঞ্জ গভমেন্ট হাইস্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন পাস করেন। তারপর তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইংরেজি বিষয় নিয়ে ভর্তি হন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারেন যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা তার সৃজনশীল বিকাশে অন্তরায়। ফলে তিনি পড়াশোনা ছেড়ে দেন। এইরকম পদক্ষেপ তৎকালীন সমাজে সাহসী এবং ব্যতিক্রমী। পড়াশোনা ছাড়ার পর তিনি ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব এবং নাট্যতত্ত্বের বিস্তৃত অধ্যয়নের মধ্যে দিয়ে তাঁর নাট্যচিন্তা ও নির্দেশনাশৈলীর ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেকে সফল অভিনেতা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। বিশেষত কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ এবং আবৃত্তিচর্চায় নিয়মিত সাধনা পরবর্তীকালে তাঁর অভিনয়ের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। সেই সঙ্গে তিনি নিয়মিত সমকালীন পেশাদার নাট্য প্রযোজনা দেখা শুরু করেছিলেন। শিশির কুমার ভাদুড়ীর অভিনয় ও মঞ্চনির্মাণ তাঁকে অভিভূত করলেও চোখ বন্ধ করে তা তিনি অনুসরণ করেননি। বরং তার পরিবর্তে গ্রহণযোগ্য উপাদান নির্বাচন করে স্বতন্ত্র নাট্যভাষা নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি বুঝতে পারেন যে তৎকালীন বাণিজ্যিক থিয়েটারের রীতি ও লক্ষ্য তাঁর নিজস্ব শিল্পদর্শনের সঙ্গে মিল খায় না। এই উপলব্ধিই পরবর্তীকালে তাঁকে বিকল্প নাট্যচর্চার পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ঔপনিবেশিক শাসন, ফ্যাসিবাদ এবং সমাজের গভীর সংকট যখন মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে তখন পেশাদারী থিয়েটার মূলত বিনোদননির্ভর নাটকেই সীমাবদ্ধ। এই উপলব্ধিটাকে নতুন নাট্যপথের সন্ধানে পরিচালিত করে। রঙমহল থিয়েটারে শিক্ষানবিশ অভিনেতাদের জন্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রতিবাদ করে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। তারপর তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান দেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সেই প্রতিষ্ঠানও ত্যাগ করেন। কারনটা ছিল মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রতি অপমানজনক আচরণের প্রতিবাদে তাঁর এই সিদ্ধান্ত। পরবর্তীকালে শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের নির্দেশনায় অভিনয়ের সুযোগ পেলেও সেখানে তিনি দীর্ঘদিন অবস্থান করেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে নিজের নাট্যচিন্তার সঙ্গে পেশাদারী মঞ্চের সীমাবদ্ধতার একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। তিনি এমন একটি নাট্যরীতির সন্ধান করেছিলেন যেখানে অভিনয়, নির্দেশনা, নাট্যবিষয় এবং সমাজচেতনা সবকিছু মিলিয়ে নতুন শিল্পরূপ লাভ করবে। ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘ এবং ইউরোপের সমাজ সচেতন নাট্য আন্দোলন তাঁর ভাবনাকে নতুন দিশা দেখায়। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অনুসন্ধানের মধ্যেই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা ঘটে। ১৯৪০ সালে তিনি 'স্বপ্নের মাঝে একটি দৃশ্য' নামে ছোট গল্প রচনা করেন। তাঁর প্রথম নাটক 'উলুখাগড়া' ১৯৪২ সালে রচিত হয়েছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে বিজন ভট্টাচার্য ও বিনয় ঘোষের সূত্রে তিনি ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে যোগদান করেন। গণনাট্য সঙ্ঘে সক্রিয় কর্মী হিসাবে তিনি বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের পরিচালনার দায়িত্বও পেয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশনা ও অভিনয়ের মাধ্যমে 'নবান্ন' কেবল একটি নাটক হিসাবে নয় বরং গণমানুষের সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 41*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 374 - 382*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

উপলব্ধি করেছিলেন যে, নাটকের প্রকৃত শক্তি মানুষের জীবন ও সময়কে শিল্পে রূপান্তর করার মধ্যেই নিহিত। তিনি শিল্পসৃষ্টিতে স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে সর্বদা চেষ্টা করতেন। ডঃ জগন্নাথ ঘোষ বলেছেন, -

> "সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে শম্ভু মিত্র গণনাট্যসঙ্ঘে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুর আহবানে যোগ দিলেও নাট্যশিল্পের উৎকর্ষ সৃষ্টির দিকেই তিনি ছিলেন সদাসতর্ক।"[১]

গণনাট্য সংঘের দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে তাঁর নাট্য দর্শন আরও সুসংহত হয়ে ওঠে। তিনি উপলব্ধি করেন যে, নাটক সমাজ সচেতন হওয়া জরুরি কিন্তু একই সঙ্গে শিল্পের স্বাধীনতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই উপলব্ধির ফলেই ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে গণনাট্য সঙ্ঘের মতাদর্শগত দূরত্ব সৃষ্টি হয়। গণনাট্য সঙ্ঘ যেখানে রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারকে নাটকের প্রধান হিসেবে গুরুত্ব দিতে চাইছিল, সেখানে শম্ভু মিত্র বিশ্বাস করতেন যে নাটকের শিল্পগত উৎকর্ষ ও মানবিক গভীরতা বজায় রেখেই সমাজ সচেতন হতে হবে। সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর যে মতাদর্শগত বিরোধ তৈরি হয়েছিল তা চারুপ্রকাশ ঘোষ মহাশয়ের রিপোর্টের স্পষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে শাঁওলী মিত্র বলেছেন, -

> "এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় আই.পি.টি.এ তাদের নৈতিক অবস্থান নিয়ে কতটা ভাবিত ছিল অথবা আদৌ তাঁরা নৈতিক পরিমণ্ডল নিয়ে ভাবিত ছিলেন কিনা। আর শম্ভু মিত্রদের মত মানুষদের সঙ্গে সেই নৈতিক ভিত্তির ক্ষেত্রেই তাঁদের মস্তো একটা ফাঁক তৈরি হয়েছে কিনা এই সময়ে। এই রিপোর্টে শম্ভু মিত্রকে পার্টির অনুপযুক্ত বলে সরাবার ইঙ্গিত আছে। আমরা তো বুঝতে পারব মহলায় সকল সদস্যদের সমান সময়ানুবর্তিতা চেয়ে তিনি। থিয়েটর বা পার্টির পক্ষে অহিতকর কোনো কার্য করবার কথা ভাবেননি! আমরা তো অন্তত এটুকু বুঝতে পারবো যে - কোনোরকম জনপ্রিয়তাই যদি পার্টির স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত করা হয়, তাহলে জবানবন্দী, নবান্ন কিংবা মুক্তধারা করবার পরিকল্পনা করবার কোনো নৈতিক ভিত্তি থাকে না! তার মানে সেদিন সেই প্রতিবাদ করে শম্ভু মিত্র ভুল করেননি!"[২]

এই মতপার্থক্যের ফলস্বরূপ তিনি গণনাট্য সংঘ থেকে সরে এসে ১৯৪৮ সালে 'বহুরূপী' নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন। 'বহুরূপী'র প্রতিষ্ঠা বাংলা নবনাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই নাট্যদলের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি আধুনিক নাট্য ভাষা নির্মাণ করা যেখানে সাহিত্য, অভিনয়, নির্দেশনা, এবং আলোক-পরিকল্পনা সবকিছু মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপ সৃষ্টি হবে। বহুরূপী বাণিজ্যিক নাট্যমঞ্চের বিরোধিতা করলেও গণনাট্যের মতো কেবল রাজনৈতিক প্রচারকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় বিশ্বাসী ছিল না। বরং শিল্প ও সমাজ সচেতনতাকে সমন্বিত করে একটি নতুন নাট্যধারার সূচনা করেছিল। অধ্যাপক দত্তাত্রেয় দত্ত সম্পর্কে বলেছেন, -

> "বহুরূপী সংগঠনের ভিত্তিভূমিতে ছিল মহর্ষির একটি কথা: যতদিন ডিসিপ্লিন থাকবে, ততদিনই বহুরূপী। বহুরূপীর তুঙ্গী সিদ্ধির মূলে শুধু শম্ভু মিত্রের অবিশ্বাস্য মাত্রার প্রতিভা ছিল না; ছিল ডিসিপ্লিনও। দলের নিয়মের সুকঠোর অনুবর্তী ছিলেন তিনি; এবং অন্যদের কাছেও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রত্যাশা করতেন। এর ওপরে তাঁর একটা ধারণা ছিল যে নাট্যকর্মীর পক্ষে নাট্যসংক্রান্ত কাজে (এমনকি ব্যক্তিগত জীবনেও) কোনরকম অসততা অবলম্বন করা অন্যায়।"[৩]

গণনাট্য সঙঘ ত্যাগের পর শম্ভু মিত্রকে নানাবিধ সমালোচনা এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু এই সমালোচনা তাঁর শিল্পচর্চাকে শিথিল করতে পারেনি। বরং তিনি আরো দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেন যে বাংলা নাট্যচর্চার জন্য একটি নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অপরিহার্য। এই উপলব্ধিকে মাথায় রেখে প্রথমে 'অশোক মজুমদার এবং সম্প্রদায়' নামে একটি নাট্য দলের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের পরামর্শে এই দলের নামকরণ হয় 'বহুরূপী'। 'বহুরূপী'র সাংগঠনিক রূপ ও শিল্পচিন্তার সঙ্গে 'গ্রুপ থিয়েটার' আন্দোলনের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্যতা লক্ষ্য করি। ১৯৩০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত গ্রুপ থিয়েটার সমষ্টিগত অনুশীলন, কঠোর শৃঙ্খলা, বাস্তবধর্মী অভিনয় এবং শিল্পনিষ্ঠ নাট্যচর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। আর এই নাট্যচর্চার প্রধান প্রেরণা ছিলেন কনস্টানি স্তানিস্লাভাস্কি। তাঁর অভিনয় দক্ষতা এবং বাস্তবধর্মী অভিনয় পদ্ধতি দলটির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'বহুরূপী' এই নীতিগুলিকে গ্রহণ

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 41*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 374 - 382*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

করতে শুরু করে। যদিও শম্ভু মিত্র সরাসরি গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শকে অনুকরণ করেননি। কিন্তু বিশ্বনাট্যের এই প্রবণতা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা, 'বহুরূপী'র সংগঠন ও নাট্যচর্চায় প্রভাব ফেলেছিল বলেই মনে হয়।

তিনি মনে করতেন একটি সুস্থ নাট্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে সচেতন দর্শক সমাজ গড়ে তোলাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই বহুরূপীর সূচনালগ্ন থেকেই নাট্যচর্চার পাশাপাশি দর্শকের সঙ্গে একটি সৃজনশীল সংলাপ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। নাট্য প্রেমীদের সঙ্গে নিয়মিত ভাববিনিময়, নাট্য বিষয়ক আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি অনুগ্রহ প্রথা চালু করেন এবং বহুরূপী পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর ফলে বহুরূপী কেবল একটি নাট্য দল হিসেবে নয় বরং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যার প্রধান লক্ষ্য ছিল কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির অনুসরণ নয়; বরং মানুষের জীবন, তার সমস্যা, ও নৈতিক সংকটকে শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করা। বহুরূপীর প্রথম দিকের প্রযোজনাগুলি হল— 'নবান্ন' (১৯৪৮), 'পথিক' (১৯৪৯), 'উলুখাগড়া' (১৯৫০), 'ছেঁড়া তার' (১৯৫০), 'বিভাব' (১৯৫১)। এই নাটক নির্বাচন করার পিছনে নাট্যকারের সমকাল চেতনার ছবি স্পষ্ট হয়। যেখানে সমকালীন সমাজবাস্তবতা, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সংকট এবং মানুষের পরিবর্তিত জীবনানুভূতি তার কেন্দ্রবিন্দু। বহুরূপীর ঘোষিত লক্ষ্য ছিল 'ভালো করে ভালো নাটক মঞ্চস্থ করা' — অর্থাৎ সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধকে উচ্চমানের নাট্যশিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করা। বহুরূপীর 'ছেঁড়া তার', 'চার অধ্যায়' বা 'দশচক্র' ইত্যাদি প্রযোজনাতে একটি ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়, তা হল ব্যক্তির নৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং মানবিক সত্যের অনুসন্ধান। এই পর্বের নাট্যনির্দেশনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, সমষ্টির অন্ধ-আনুগত্যের পরিবর্তে ব্যক্তি-বিবেকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্য আধুনিক নাট্যচিন্তা বিশেষত অস্তিত্ববাদী মানবতা, ইবসেনীয় ব্যক্তি স্বতন্ত্র এবং ব্রেখটীয় সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে ভারতীয় সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে সৃজনশীল ভাবে যুক্ত করে তিনি বাংলা নবনাট্যে এক নতুন নাট্যভাষা নির্মাণ করেন।

শম্ভু মিত্রের রচিত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'উলুখাগড়া' (১৯৪২), 'একটি দৃশ্য' (১৯৪২-৪৩), 'ঘূর্ণি' (১৯৫০), 'বিভাব' (১৯৫১), 'কাঞ্চনরঙ্গ' (১৯৬৩), এবং 'চাঁদ বণিকের পালা' (১৯৭৭)। তিনি হেনরিক ইবসেনের 'এ ডলস্ হাউসে'র বাংলা রূপান্তর 'পুতুলখেলা' এবং সফোক্লিসের 'ওয়দিপাস রেক্সের' বাংলা রূপান্তর 'রাজা অয়দিপাউস' নাট্যরূপে উপস্থাপন করেন। এই রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে নাট্যকার দেশীয় নাট্যধারা ও পাশ্চাত্য নাট্যভাবনার সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের উত্তাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর প্রথম নাটক উলুখাগড়া রচিত হয়। নাটকটি প্রথমে ছদ্মনামে প্রকাশিত হলেও ১৯৫০ সালে বহুরূপীর প্রযোজনায় শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় তা মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে তিনি মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের সংকটকে বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। দেবব্রত মিত্র নামক চরিত্রটি সুবিধাবাদী, ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ, আদর্শহীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় মানুষ। সে বলে, -

> "এই হল তোমার সাধারণ মানুষ। কতটুকু স্বাধীনতা পাবার যোগ্য এরা? সমাজ হল এদের জন্যে, যারা একলা দাঁড়াতে অক্ষম। দেখো মিনতি, যারা খুব রোমান্টিক আদর্শবাদীর মতো ছোট বড় সকল রকমের মানুষকে একটা গড়পড়তা মাপে আঁট ক'রে ধরতে চায় তারা বাস্তবের একটা আসল কথা ভুলে গেছে। সেটা হচ্ছে যে আমরা হলাম জানোয়ারের সন্তান। আমরাই পূর্বজন্মে জানোয়ার ছিলাম, এবং বাঁচবার প্রধান উপায় হল ওই জানোয়ারের মতো লড়াই করতে পারা। Struggle for existance, তা নইলে বাঁচা যায় না।"[৪]

সে আরো বলে, -

> "দারিদ্র্য তো চিরকাল আছে, তো আজ কেন এত ছটফটানি? পঞ্চাশ বছর আগে সাধারণ মানুষ যে অবস্থায় ছিল আজ তার চেয়ে ভালো অবস্থায় নেই? বেশি দূর যাবার দরকার নেই, এই কলকাতা শহরে একপাশ থেকে আর একপাশে যেতে হলে পুঁটুলিতে চিঁড়ে বেঁধে পদব্রজে রওনা হতে হত। আর আজ অত্যন্ত শস্তায় যে কোনো লোক যে কোনো জায়গায় ট্রামে বাসে চড়ে চলে যাচ্ছে। ... তা এত সুবিধা পেয়েও মানুষের আজ এত ছটফটানি বেড়েছে কেন? ভাবলে বোঝা যায় যে ডেমোক্র্যাসির fetish করে

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 41*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 374 - 382*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

> সাধারণ লোককে বড্ড বেশি সুবিধে দেওয়া হয়েছে, আর তারই আহ্লাদে তারা বড্ডো বেশি চেঁচামেচি করতে শুরু করেছে। তারা ভুলে যাচ্ছে যে সভ্যতা জনসাধারণের ক্ষমতায় এগোয় না। একটা গ্যালিলিও, একটা নিউটন, কিংবা একটা এডিসন এক একটা ঝটকায় পৃথিবীটাকে এক একশো বছর এগিয়ে নিয়ে এসেছে। তাদের পথ পরিষ্কার রাখতেই হবে।”[৫]

উদ্ধৃত বক্তব্যের সমাজ গণতন্ত্র এবং সাধারণ মানুষ সম্পর্কে একটি অভিজাতান্ত্রিক ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছে। দেবব্রতর মতে, দারিদ্র্য মানব সমাজের চিরন্তন বাস্তবতা, তা নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বেগ বা প্রতিবাদের কোন যৌক্তিকতা নেই। অতীতের তুলনায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কিছু উন্নতি হয়েছে। যেমন, যাতায়াতের সুবিধাবৃদ্ধি এই যুক্তি দেখিয়ে তিনি আসলে বর্তমান মানুষের অসন্তোষকে অমূলক বলে প্রতিপন্ন করতে চান। একই সঙ্গে সে মনে করে গণতন্ত্র সাধারণ মানুষকে অতিরিক্ত অধিকার ও সুযোগ দিয়েছে বলেই তারা ক্রমশ দাবি-দাওয়া ও প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। গণতন্ত্রের প্রতি এক ধরনের সংশয় এবং সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতার প্রতি অবজ্ঞা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তারই বিপরীতে করুণা চরিত্রটি সাধারণ মানুষের অসহায়তা, বঞ্চনা এবং নীরব যন্ত্রণার প্রতীক।

তাঁদের দুজনের পারিবারিক সম্পর্কের সংকট আরো গভীরতা লাভ করে তাদের সন্তান বিনোদ ও নীনার উপস্থিতিতে। বিশেষত বিনোদ চরিত্রটি আত্মপরিচয়ের সংকটের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। নিজের জন্ম পরিচয় সম্পর্কে দীর্ঘদিনের সংশয় দূর হবার পর সে উপলব্ধি করে যে তার জন্ম ঘৃণা বা প্রতারণার নয়। বরং দুই মানুষের স্বাধীন ভালোবাসার ফল। এই উপলব্ধি তার আত্মসম্মানবোধকে পুনরুদ্ধার করে এবং একই সঙ্গে তাকে তার পিতার ভন্ডামি ও নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তোলে। দেবব্রতর অতীত রাজনৈতিক আদর্শ বর্তমান সুবিধাবাদী অবস্থান এবং ব্যক্তিগত জীবনের প্রতারণাকে বিনোদ নির্ভীকভাবে প্রশ্ন করে, -

> “শুনেছি আপনি কলেজে পড়ার সময়ে বৃটিশ গভর্নমেন্টের এক কঠোর সমালোচক ছিলেন, কিন্তু পাশ করে তাদের হাত থেকে শাসনভার নেবার সময় তো আপনার লজ্জা করেনি। শুনেছি আপনি একজন শিক্ষিত লোক কিন্তু একটি নির্বোধ কুমারী মেয়ের উপর সুবিধা নিতে তো আপনার লজ্জা করেনি। শুনেছি আপনি ভদ্রসমাজে জন্মেছেন, – একজন ভদ্রলোক, – কিন্তু আজ আইন বা পুলিশের সাহায্য নেবার সময়ে অনর্গল মিথ্যে বলতেও তো আপনার লজ্জা করে না। এমন বাপের ছেলে আমি, লজ্জাটা কি অমনি থাকলেই হল? অত সোজা নয়।”[৬]

—এই প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে নাটকে নতুন প্রজন্মের নৈতিক সচেতনতা ও সত্যানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। এই নাটকের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও গভীর মানসিক বিচ্ছিন্নতার ছবি। তারা একই ছাদের নিচে বাস করলেও পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে নেই আন্তরিকতা বিশ্বাস বা মানবিক সংযোগ। এই বিচ্ছিন্নতা কেবল পারিবারিক সংকট নয়; এটি সমকালীন সমাজে ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা ও আত্মপরিচয়ের সংকটেরও প্রতীক। পাশ্চাত্য নাটকের যে আউটসাইডার বা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি সত্তার ধারণা গুরুত্ব পায় তার একটি মৌলিক দেশীয় রূপের আভাস নাট্যকার এই নাটকে নির্মাণ করেছিলেন।

তিনি ‘একটি দৃশ্য’ নামক একটি অসম্পূর্ণ নাটক রচনা করেছিলেন। এর বিষয়বস্তু সমকাল চেতনার ফসল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক বিপর্যয় সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কে একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করেছেন। দারিদ্র্যের করালগ্রাসে জর্জরিত এক পিতা নিজের কন্যাকে অর্থের বিনিময়ে সেনাদের কাছে পাঠাতে বাধ্য হওয়ার ঘটনাটি যুদ্ধকালীন সমাজবাস্তবতার নির্মমতাকে উন্মোচিত করে। এভাবেই উলুখাগড়ার মতো একটি দৃশ্য ব্যক্তিগত জীবনের সংকটের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সামাজিক সত্যকে প্রকাশ করে। বহুরূপীর সম্পাদক লিখেছিলেন, -

> “হঠাৎ বন্ধু প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য খবর দেন যে শ্রীশম্ভু মিত্রের একটি পুরোনো নাটিকা শ্রীসুধী প্রধানের কাছে রাখা আছে। আমরা এটি পেতে এবং প্রকাশ করতে আগ্রহ প্রকাশ করি। শ্রীভট্টাচার্যের উদ্যোগে শ্রীশ্যামলী সুর নাটিকাটি কপি করে আনেন। মূল পাণ্ডুলিপি শ্রীপ্রধানের কাছে আছে। ১৯৪৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর মিনার্ভায় গঙ্গাপদ বসুর নির্দেশনায় ‘একটি দৃশ্য’ অভিনীত হয়। সেদিন এর সঙ্গে অন্য অনুষ্ঠান

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 41*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 374 - 382*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

> ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ব্যালে 'দিস আওয়ার ল্যান্ড'। নির্দেশনার সময় গঙ্গাপদ বসু এতে কিছু মঞ্চনির্দেশ ইত্যাদি যোগ করেন। আমরা শ্রীবসুর সংযোজন বাদ দিয়ে শ্রীশম্ভু মিত্রের লেখা অবিকল ভাবে ছেপেছি।"[৭]

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র গাতি। চরম দারিদ্র্যের চাপে তার পিতা অর্থের বিনিময়ে তাকে সেনা বাহিনীর কাছে পাঠাতে বাধ্য হয়। এই ঘটনা শুধু একটি পরিবারের ট্র্যাজেডি নয়, বরং যুদ্ধকালীন সমাজে মানবিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের প্রতীক। একসময়ের আদর্শবাদী শিক্ষক জীবনের কঠোর বাস্তবতায় পরাজিত হয়ে নিজের নৈতিক অবস্থানকে বিসর্জন দেন। সাধনের বক্তব্যে তার পিতার নৈতিক অবক্ষয়িতার বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, -

> "আমি তোমাকে পঞ্চাশবার বলেছি যে জুতিয়ে বার করে দাও ওটাকে বাড়ি থেকে, —তা না বাপ। আরে, বাপের মতো থাকলে তবে তো বাপ, ধেনো মদ খায় আর নর্দমায় পড়ে থাকে, অমন শালা বাপ থাকার চেয়ে বেজন্মা হওয়া ভালো! এই দেখ না, কাল রাত্তিরে ভজাদের পাড়ায় গিয়ে ফের মাতলামি করে এসেছে।"[৮]

পরিবারের ছোট ছেলে সাধন কালোবাজারি ও অবৈধ ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনকে স্বাভাবিক বলে মনে করে। সে তার দাদা নগেনকে বলে, -

> "কিসের জন্যে আমার টাকা তুমি সংসার খরচে নাও না? তুমি খালি লোককে দেখাতে চাও যে বাড়তি খেটে একা সংসার চালাচ্ছ তুমি, তুমি কি ভালো! — আরে, খারাপ উপায়ে রোজগার না করে কে? তুমি করো না? সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তুমি এমন একটা লোক খুঁজে দাও দেখি যে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে যে তার টাকা ধর্মের টাকা!"[৯]

আর নগেনের স্ত্রী অর্থনৈতিক নিরাপত্তার স্বার্থে সেই অনৈতিক পথকে সমর্থন করে ব্যাঙ্গের সুরে স্বামীকে বলে, -

> "লম্বা লম্বা কথার বাহার খুব! পাপের ভারে ভরাডুবি হতে চলল সংসার। আর উনি এখন গলাবাজি করছেন– পাপ যেন না ঢোকে। বোন বেরিয়ে যাচ্ছে, বাপ গিয়ে দালালি করছে, — লজ্জা করে না তোমার সাধু সাজতে।"[১০]

সে আরো বলে, -

> "এই যে একখানা আস্ত কাপড় নেই আমার, একাদশীর দিন দাঁতে কাটবার মত একখানা আঁশ-ও জোটে না যে কপালে, এ কার দোষ? বিয়ে করতে গিয়েছিলে কোন মুখে চন্দনের ফোঁটা মেরে। যদি একখানা কাপড় পর্যন্ত রোজগারে না জোটে? আর তত অপদার্থই যদি হও তো মুখ বুঝে ভিক্ষে নাও লোকের কাছে, বড়ো বড়ো কথা শোনাতে যাও কোন আক্কেলে? — ঠাকুরপো মন্দ লোক। ঠাকুরপো তোমার চেয়ে ঢের যুগ্যি লোক এ কথাটা মনে রেখো।"[১১]

সংলাপের মধ্য দিয়েই বোঝা যায়, পরিবারের প্রত্যেককেই কোনো না কোনোভাবে সামাজিক অবক্ষয়ের শিকার। নাট্যকার নাটকটিকে সম্পূর্ণ নৈরাশ্যের মধ্যে শেষ করেননি নগেন চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি মানবিক সম্ভাবনা ও প্রতিরোধের পথ উন্মুক্ত রেখেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'উলুখাগড়া' ও 'একটা দৃশ্য' নাটকের মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। 'উলুখাগড়া'য় সুরেশ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে নৈতিক আহ্বান জানায়, এই নাটকে নগেন সেই প্রতিবাদকে বাস্তবকর্মে রূপ দেয়ার চেষ্টা করে ফলে প্রতিবাদ এখানে কেবল বক্তব্যের সীমাবদ্ধ থাকে না বরং কার্যকর প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে।

'ঘূর্ণি' নাটকে নাট্যকার স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলার এক গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, কালোবাজারি, তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা – এই সমস্ত ঘটনা প্রবাহ নাটকের পটভূমিকাকে বিস্তৃত করেছে। তিনি দেখিয়েছেন, বৃহত্তর সামাজিক অভিঘাত কিভাবে মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক সম্পর্ক এবং মানসিক জগৎকে গভীরভাবে বিপর্যস্ত করেছে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবেনবাবু। নাটকে তিনি অবক্ষয় গ্রস্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তার শালা অবিনাশ

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 41*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 374 - 382*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

যুদ্ধকালীন ফাটকা ব্যবস্থা ও কালোবাজারি মাধ্যমে দ্রুত অর্থশালী হয়ে ওঠে। এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে নাট্যকার দেখিয়েছেন, যুদ্ধ ও সংকটের সময়ে সমাজের নৈতিকতার পরিবর্তে অর্থই প্রধান হয়ে ওঠে। একসময়ের প্রেস মালিক দেবেনবাবু শেষ পর্যন্ত নিজের প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে সেই প্রতিষ্ঠানেরই বেতন ভোগী কর্মচারী হতে বাধ্য হন। এই ঘটনাটি মধ্যবিত্তের আর্থিক পতনের পাশাপাশি তার আত্মমর্যাদা ভাঙ্গনের গল্প। বিকাশ বোস এ নাটকে আদর্শবাদী ও প্রগতিশীল লেখক রূপে উপস্থিত হয়েছে। তিনি সমাজপরিবর্তনের স্বপ্ন দেখলেও বাস্তব অভিজ্ঞতা তাকে আত্মসমালোচনার মুখোমুখি দাঁড় করায়। সে বলে, -

> "ক্ষণের মধ্যে বাঁচা। ভবিষ্যতে বিশ্বাস নেই, তাই জীবনের চেয়ে মুহূর্ত বড়ো। আমিও এই পাপ করেছি। আমিও চেয়েছি একটা উগ্র মুহূর্তে জ্বলে ফেটে চৌচির হয়ে সার্থক হই। ভেবেছি, সুস্থ বিপ্লবের কথা। মুখে বলেছিও। কিন্তু নিজেরই অজান্তে, প্রায় মনের ভিতরে, এই আক্রোশজনিত জীবনবেদ সেই বিপ্লবের তলা ক্ষইয়ে দিয়েছে।"[১২]

নাটক সম্পর্কে নাট্যকার নিজেই বলেছেন, -

> "প্রথমেই শোনা গেল এ আজাদী সত্য নয়, এটা মিথ্যা। দলে দলে ছিন্নমূল লোকেরা এসে পশ্চিমবঙ্গের স্বল্প পরিসরকে ভরিয়ে রেখেছে, এবং এখনো রাখছে। তখন সকলে মিলে মানুষের দুর্দশা দূর করার চেষ্টার বদলে রাজনৈতিক দলেরা ছিন্নমূলদের নিয়ে ব্যবসা শুরু করল। ... এরই পটভূমিকায় এবং নাট্য প্রযোজনায় একটা নতুন ভঙ্গি আবিষ্কারের চেষ্টায় — ঘূর্ণি লেখবার কষ্টকর প্রচেষ্টা।"[১৩]

শম্ভু মিত্রের নাট্যচিন্তার পূর্ণাঙ্গ শিল্প রূপ হল 'চাঁদ বণিকের পালা'। এই নাটকটিকে মধ্যযুগীয় 'মনসামঙ্গল' কাব্যের সুপরিচিত আখ্যানকে আধুনিকতার আলোকে পুনর্নির্মাণ করেছেন এবং পৌরাণিক মিথের ভিতর দিয়ে সমকালীন সমাজবাস্তবতার গভীর সংকটকে প্রকাশ করেছেন। এই নাটকের কাহিনীকে কেন্দ্র করে তিনি ব্যক্তি মানুষের সত্যানুন্ধান, ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, মূল্যবোধের সংকট এবং সভ্যতার অস্তিত্বগত প্রশ্নকে নতুন অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। শম্ভু মিত্রের কাছে পুরান অতীতের স্মৃতিচিহ্ন নয়, বর্তমানকে অনুধাবনের একটি কার্যকর নাট্যভাষা। তাঁর পূর্ববর্তী নাটকগুলিতে সমকালীন সামাজিক বাস্তবতা সরাসরি উপস্থাপিত হলেও এই নাটকে তিনি প্রতীক, মিথ এবং রূপকের আশ্রয়ে সেই বাস্তবতাকে আরো গভীর দার্শনিক স্তরে উন্নীত করেছেন। নাটকটি একদিকে যেমন ইতিহাস ও পুরাণের বিনির্মাণ তেমনি অন্যদিকে, আধুনিক মানুষের অস্তিত্ব সংকট, নৈতিক দ্বন্দ্ব এবং সত্যের অনুসন্ধানের এক অনন্য মেলবন্ধন।

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র চাঁদ বণিক, সে চম্পক নগরীর বণিক সমাজকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দে সমৃদ্ধ করতে চায়। পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য এবং মানবিক লক্ষ্য তার কর্ম প্রেরণার উৎস। তাঁর সংগ্রাম কেবল দেবী মনসার বিরুদ্ধে নয় বরং সময়ের অন্ধকার, ভয়, আপস এবং মূল্যবোধহীনতার বিরুদ্ধে। নাটকের শুরুতেই তাঁর সমুদ্রযাত্রার প্রস্তুতি এক আশাবাদী ও আত্মবিশ্বাসী পরিবেশ তৈরি করে। কিন্তু এই যাত্রার শুরুতেই নানান বাধা আসতে শুরু করে। প্রথম বাধা আসে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তর থেকে। দ্বিতীয় প্রতিরোধের সূত্রপাত হয় অভিযাত্রী দলের ভিতরেই। আর তৃতীয় এবং সবচেয়ে তীব্র প্রতিঘাত আসে পারিবারিক স্তর থেকে। সে জানতে পারে তাঁর সহধর্মিনী সনকা গোপনে মনসার পূজা করছে। চাঁদ বণিক শিবের উপাসক। এটা জেনেও স্ত্রীর এই দ্বিচারিতা চাঁদকে বিশ্বাসভঙ্গের ব্যক্তিগত বেদনায় আঘাত করে। একটা ঘর কেবল ইট পাথর বালি দিয়ে গড়ে ওঠে না, তা পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক বিশ্বাস, ভরসা ও ভালোবাসায় গড়ে ওঠে। আর সেই বিশ্বাস একবার নষ্ট হয়ে গেলে, পরিবারও তার অস্তিত্ব হারায়। ব্যক্তিগত সংকটের পাশাপাশি মানবিক সম্পর্কের সংকটের ঘেরাটোপে পড়ে চাঁদ বনিক। নাটকের প্রথম পর্বে তিনটি পরস্পর সম্পর্কিত প্রতিরোধ শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্র প্রশাসনের ক্ষমতা, সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিভাজন, এবং পরিবারের অন্তর্গত বিশ্বাসের সংকট - এই তিন অভিযাত্রা কেবল একটি পৌরাণিক কাহিনীর ঘটনা নয়, তা আধুনিক মানুষের নৈতিক, সামাজিক ও অস্তিত্বগত সংগ্রামের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এই নাটকটি শম্ভু মিত্র দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লিখেছিলেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 41*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 374 - 382*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

> "প্রথমত এই নাটকে দেশীয় তথা ভারতীয় নাটকের চেহারা কেমন হবে, তার একটা নমুনা নাট্যমোদী মহলের কাছে তিনি তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয়ত, দেশীয় থিয়েটারের নাট্যভাবনায় থাকবে বিদেশি নাট্যচিন্তার মিশ্রণ।"[১৪]

মূল ঘটনা আমাদের কম বেশি সকলেরই জানা। তাই নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা না দিয়ে নাট্যকারের নাট্যদর্শন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করাই এই গবেষণাপত্রের মূল লক্ষ্য। পিতা পুত্রের আদর্শগত সংঘাতের পর নাটকের ঘটনা প্রবাহে রাজনৈতিক শক্তির প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ শুরু হয়। এই পর্যায়ে বেণীনন্দন ও বল্লভাচার্য চাঁদ সদাগরকে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। একই সময়ে প্রতিপক্ষ শক্তির প্রতিনিধি করালি ও ভৈরব চাঁদকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে উদ্যত হয়। ফলে চাঁদ এখানে একজন ব্যক্তি হিসেবে নয় বরং সামাজিক প্রভাব সম্পন্ন এক প্রতীকে শক্তি হিসেবে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রে পরিণত হন। নাট্যকার আসলে দেখাতে চেয়েছেন যে, ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির কাছে নীতি বা আদর্শের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রভাবশালী ব্যক্তিকে নিজেদের পক্ষে টানা। চাঁদের বিরোধী শক্তি গুলো তাকে মনসার প্রকৃত ভক্তরূপে পরিণত করতে চায় না, তারা চায় চাঁদ সদাগর যেন নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে আপোষ করে ভন্ডামীর আশ্রয় নেয়। অর্থাৎ তাদের কুকর্মের সঙ্গে সেও যেন হাত মেলায়। কারণ, আদর্শে অবিচল একজন মানুষ ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির কাছে বিপজ্জনক; কিন্তু আদর্শচ্যুত মানুষকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই সংকটময় মুহূর্তে নরহরি চাঁদের সামনে এক গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করে, -

> "তুমি তো আদর্শবাদী। তুমি মর্‌্যে গেলে কতো লোক কতো যুগ ধ'রে তোমার কাহিনী গেঁথ্যে গ্রামে-গ্রামে গান গায়্যা যাবে। ... আমরা যে কল্পনায় চাঁদ বণিকের একটি মূর্তি গড়্যে নিছি। আমাদের সেই কল্পনার মূর্তিট্যারে চূর্ণ করে দেওনের কোনো অধিকার নাই তোমার বণিক। তুমি তো কেবল তোমার নিজের নও। তুমি মানুষের কল্পনার। তোমার সে দায় তুমি মনে রেখো, চন্দ্রধর সদাগর।"[১৫]

নাটকের দ্বিতীয় পর্বে ব্যক্তিগত পরাজয়, পারিবারিক বিপর্যয় এবং সামাজিক প্রত্যাখ্যানের মধ্যেও তিনি বিশ্বাস করেন যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাত ধরেই তার অসমাপ্ত সাধনা পূর্ণতা লাভ করবে এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই নাটকের তৃতীয় পর্বে সূচনা ঘটে। দ্বিতীয় পর্বে নাটকের সংঘাত আরো জটিল ও বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে। একদিকে চাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা তার চরম দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নতুন অভিযানের বিরোধিতা করেন, অন্যদিকে সনকা মনে করেন চাঁদ নিজের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য পুত্রকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতেও প্রস্তুত। তাঁর দৃষ্টিতে সমুদ্র যাত্রা কোনো ভবিষ্যতের স্বপ্ন নয় বরং লখিন্দরকে হারানোর সম্ভাবনাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা। এরপর লখিন্দরের বিবাহ, তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা ব্যক্তিগত শত্রুতা সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক ও সহিংসতার প্রতীকে রূপ নেয়। তারাপতি কর্মকার কিংবা ভয়িল ওঝার মত সাধারন মানুষও ভয়, চাপ ও ক্ষমতার বলয় আটকে গিয়ে এই ষড়যন্ত্রের অংশ হয়ে ওঠে। নাট্যকার এখানে দেখিয়েছেন যে, সন্ত্রাসের রাজনীতিতে অপরাধীরা যেমন সক্রিয় থাকে তেমনি ভীত ও অসহায় সাধারণ মানুষও অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই ব্যবস্থার অংশে পরিণত হয়। নাটকে লোহার বাসর ঘরের ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে যখন কাল নাগিনীর দংশনে লক্ষিন্দরের মৃত্যু হয় তখন ই নাটকের চরম ট্র্যাজিক পরিণতির সূচনা ঘটে। একদিকে চাঁদ ও সনকার দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের অন্তরঙ্গ মুহূর্ত, অন্যদিকে নব দম্পতি লক্ষিন্দর বেহুলার ভালবাসা ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন – এই মানবিক উষ্ণতার সমান্তরালে নিঃশব্দে এগিয়ে চলে হত্যার ষড়যন্ত্র। এটা দেখে দর্শক একই সঙ্গে প্রেম ও মৃত্যুর, আশা ও সর্বনাশের, জীবনের এবং ধ্বংসের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়।

বাংলা নাটকের সমকালীন ধারায় শম্ভু মিত্রের স্বতন্ত্রতা এখানেই। বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে যেখানে প্রান্তিক মানুষের সমষ্টিগত জীবন সংগ্রাম মুখ্য, উৎপল দত্তের নাটকে সেখানে রাজনৈতিক মতাদর্শ ও শ্রেণীর সংগ্রাম প্রধান হয়ে ওঠে, অন্যদিকে বাদল সরকারের নাটকে নগর, মধ্যবিত্ত মানুষের অস্তিত্ব-সংকট এবং সামাজিক-বিচ্ছিন্নতা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু শম্ভু মিত্র তাঁর নাট্যচিন্তার কেন্দ্রে রেখেছেন ব্যক্তিমানুষের নৈতিক-চেতনা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এবং আত্মসংগ্রাম। সুতরাং, তাঁর নাট্য ভাবনার বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করা যায় যে তিনি নাটককে কেবল রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যম হিসাবে মনে করেননি; বরং সমাজ, ব্যক্তি, এবং সত্যের জটিল সম্পর্ক অন্বেষণের একটি স্বাধীন

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 41*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 374 - 382*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

শিল্প মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। একই সঙ্গে বহুরূপীর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলা নবনাট্যের স্বতন্ত্র নাট্যদর্শন নির্মাণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। শম্ভু মিত্রের গণনাট্য থেকে নবনাট্যে উত্তরণ কেবল সংগঠনিক পরিবর্তন ছিল না; এটি ছিল বাংলা নাট্যচিন্তার এক মৌলিক রূপান্তর, যা আধুনিক বাংলা নাটকের বিকাশে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

**Reference:**

১. ঘোষ, জগন্নাথ, শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তক মেলা জানুয়ারি ১৯৯৮, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৪
২. মিত্র, শাঁওলী, গণনাট্য নবনাট্য সৎনাট্য ও শম্ভু মিত্র, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ২৮
৩. দত্ত, দত্তাত্রেয়, শিবের সন্ধানে চাঁদ বণিক ও শম্ভু মিত্র, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৪১৭, বিদ্যা, ১১ রাজা রামমোহন রায় রোড, নবপল্লী, বারাসাত, কলকাতা ৭০০ ১২৬, পৃ. ৪৬৩- ৪৬৪
৪. মিত্র, শাঁওলী (সম্পাঃ), শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র ১, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭ ০০০০৯, পৃ. ২৫১
৫. তদেব, পৃ. ২৫৯
৬. তদেব, পৃ. ২৭৭
৭. তদেব, পৃ. ২৯৯
৮. তদেব, পৃ. ২৮৭
৯.তদেব, পৃ. ২৯২
১০. তদেব, পৃ. ২৯৩
১১. তদেব, পৃ. ২৯৩
১২. তদেব, পৃ. ৩৪৬
১৩. তদেব, পৃ. ৩৬০
১৪. ঘোষ, জগন্নাথ, শম্ভু মিত্রের চাঁদ বণিকের পালা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৫, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৬৯
১৫. মিত্র, শাঁওলী (সম্পাঃ), শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র ৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭ ০০০০৯, পৃ. ৩৬৮